OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 630 - 639
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

চা-বাগান, শ্রম ও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা : আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও রামকুমার বিদ্যারত্ন

অসীম বিশ্বাস
গবেষক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: ashimb861@gmail.com
0009-0002-6362-3216
এবং
ড. গীতা রানী দাস
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গুরুচরণ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: dasgeeta705@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
আসাম, চা-শ্রমিক, কুলি, রামকুমার বিদ্যারত্ন, চা-কুলি আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ, ঔপনিবেশিকতা, শ্রম, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুলি কাহিনী।

Abstract

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আসামের চা-শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশের পাশাপাশি এক নিয়ন্ত্রিত ও শোষণমূলক শ্রমব্যবস্থারও জন্ম দেয়। বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক শ্রম, চলাচলের উপর বিধিনিষেধ এবং বাগানকেন্দ্রিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে 'কুলি' পরিচয় ক্রমে এক স্বতন্ত্র ঔপনিবেশিক শ্রম-পরিচয়ে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্নের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আসাম সফরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রচিত তাঁর উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ, কুলি কাহিনী এবং সঞ্জীবনী-তে প্রকাশিত লেখাগুলিতে চা-শ্রমিকদের জীবন, নিপীড়ন ও আইনগত অসহায়তার যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা সমকালীন বাঙালি শিক্ষিত সমাজে এক নতুন সচেতনতার জন্ম দেয়। কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও রামকুমার বিদ্যারত্ন গ্রন্থকে ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এই প্রবন্ধের যুক্তি – রামকুমার কেবল শ্রমিক-দুর্দশার ভাষ্যকার ছিলেন না; তাঁর লেখনী ঔপনিবেশিক শ্রম-শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রাথমিক জনপরিসরের এক তাৎপর্যপূর্ণ হস্তক্ষেপ। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান, সংবাদপত্রের প্রচার এবং চা-কুলি আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে রামকুমারের রচনাকে যুক্ত করে এই আলোচনা শ্রম, ক্ষমতা, জনমত ও প্রতিরোধের পারস্পরিক সম্পর্ককে অনুসন্ধান করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

আসামের চা-শিল্প ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শ্রম-ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উনিশ শতকে চা একটি বাণিজ্যিক ফসলে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসামের ভূ-প্রকৃতি, বনভূমি, জমির ব্যবহার এবং শ্রমব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এই শিল্পের বিকাশ কেবল চা-গাছের আবিষ্কার, বাগান প্রতিষ্ঠা বা বিশ্ববাজারে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির ইতিহাস নয়, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের নিয়োগ, তাঁদের ভৌগোলিক স্থানান্তর, চুক্তিবদ্ধ শ্রম, শ্রমিকের চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং বাগান-প্রশাসনের কঠোর শৃঙ্খলা। এই শ্রম ব্যবস্থার মধ্যেই 'চা-কুলি' নামে একটি স্বতন্ত্র ঔপনিবেশিক পরিচয়ের নির্মাণ ঘটে। পরবর্তী সময়ে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী জনমত গড়ে ওঠে, তার ইতিহাসে রামকুমার বিদ্যারত্নের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও রামকুমার বিদ্যারত্ন গ্রন্থে লিখেছেন, -

> "আসাম এক মাত্র চা-র জন্যই সমস্ত ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইংরেজদিগের যত্ন ও পরিশ্রমে আসামের চা ক্ষেত্রের এক্ষণ এত ঔৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে যে পৃথিবীর অপরাপর স্থানের চা হইতে আসামের চা সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজরাই এই চা-র আবিষ্কারক।"[১]

এই বক্তব্যকে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক চা-ইতিহাসের একটি সমকালীন ব্যাখ্যা হিসেবে পড়া প্রয়োজন, কারণ আসামে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো চা-গাছ সম্পর্কে স্থানীয় জ্ঞান ও ব্যবহার ব্রিটিশ অনুসন্ধানের পূর্ববর্তী। তবু ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও ইউরোপীয় বাগান-মালিকদের উদ্যোগে চা-কে যে বৃহৎ বাণিজ্যিক শিল্পে পরিণত করা হয়েছিল, তা আসামের ইতিহাসে একটি গভীর পরিবর্তন ঘটায়।

১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতে চা-আবাদ সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রকাশ করার পর ব্রিটিশ সরকার চা-চাষের সম্ভাবনা অনুসন্ধানের জন্য ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি সমিতি গঠন করে। এই সমিতির কাজ ছিল ভারতে কোথায় চা গাছ পাওয়া যায়, কোন অঞ্চলে চা-চাষ সম্ভব, কোন ধরনের ভূমি চা-চাষের উপযোগী এবং শ্রম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদের কী সম্ভাবনা রয়েছে, তা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পেশ করা। এই অনুসন্ধানের ফলে আসামে চা-চাষকে বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ক্রমশ সুসংগঠিত হয়।

ইংরেজদের ভারতে আগমনের পূর্বেই আসামে চা-গাছের অস্তিত্ব ছিল এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসন সেই উদ্ভিদকে বাণিজ্যিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বৃহৎ পরিসরে তার চাষ ও উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ উদ্ভিদবিদ্যা, বাণিজ্যিক পুঁজি, প্রশাসনিক উদ্যোগ এবং স্থানীয় পরিবেশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে ব্রুস ভ্রাতৃদ্বয়ের ভূমিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, -

> "আসাম ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইবার পূর্বাবধি ব্রুশ নামধেয় দুই জন ইংরেজ এই প্রদেশে বাণিজ্য ব্যবসা করিতেছিলেন। ১৮২৪ সনে ব্রহ্ম-দেশের সঙ্গে ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠতম মিঃ সিঃ এ ব্রুস্ রণতরির অধ্যক্ষ হইয়া আসাম প্রদেশে আগমন করেন। এবং তিনিই উপর আসামের অরণ্য হইতে এক প্রকার গুল্ম ও ঐ গুল্মের ফল সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করেন। অবশেষে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, উক্ত গুল্ম চা-বৃক্ষ এবং উক্ত ফলই চা ফল। কনিষ্ঠ ব্রুস্ আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ঐ গুল্ম প্রদান করেন। তিনি উহা পূর্বোক্ত সভাকে প্রদান করিয়া এই প্রকার বলেন যে, আসামে অনেক চা গুল্ম আছে এবং আসামই চা আবাদ করিবার উপযুক্ত স্থান। চা সভা এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তাহার পর আসামের কমিসনার জেস্কিস্ সাহেব উক্ত সভাকে অবগত করান যে, উপর আসা-মের সদীয়া হইতে প্রান্তচীনের ইয়ুনিয়ান পর্যন্ত ষষ্ঠাংশ ভূমিতে স্বভাবজাত চা গুল্ম পাওয়া যায়। ইহার অব্যবহিত পরেই ডাক্তার মেকলেন, ডাক্তার প্রিক্স ও অপর একজন ভৈষজ্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উক্ত সভা হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া এ প্রদেশে আগমন করেন। ইহারা আসামের ভূমি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, আসামে চা আবাদের উপযুক্ত ভূমি আছে এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> তাঁহারাই স্বভাবজাত চা গুল্ম দর্শন করিয়া ব্রুস্ সাহেবকে ঐ গুল্ম রক্ষণাবেক্ষণ ও নূতন ভূমি আবাদের জন্য ওভার-সিয়ার নিযুক্ত করেন।”[২]

প্রারম্ভিক পর্যায়ে চীনা চা-বীজও আসামে আনা হয়। চা-চাষকে একটি বাণিজ্যিক শিল্পে রূপ দেওয়ার কাজে ব্রুস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৩৭ সালে চীন থেকে একজন অভিজ্ঞ চা-শ্রমিক এনে চা প্রস্তুত করা হয় এবং কলকাতায় সেই চা উচ্চমূল্যে বিক্রি হয়। এর ফলে আসামে চা উৎপাদনের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে উত্তর আসামের উজান অঞ্চলে একের পর এক চা-বাগান গড়ে উঠতে থাকে।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে আসামে মোট ৫১টি চা-বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই সময় বাগানের দখলে ছিল প্রায় ৮,০০০ একর জমি। পরবর্তী কয়েক দশকে চা-বাগানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৪ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে নথিভুক্ত কোম্পানিগুলির মধ্যে চা-বাগান-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ১৮৮০ সালের মধ্যে বাগানের সংখ্যা ৭৮০-তে পৌঁছায় বলে বিভিন্ন বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। ডিব্রুগড়ে ২১২, শিবসাগরে ২৫২, তেজপুরে ১১৫, গোয়ালপাড়ায় ৭, গৌহাটিতে ৬৪ এবং নগাঁওয়ে ১৩০টি বাগান গড়ে ওঠে। মোট ৩,৭০,২৪৭ একর জমিতে চাষ হচ্ছিল বলে কানাইলালের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আসামের চা-শিল্প দ্রুত সম্প্রসারিত হয় এবং এই সম্প্রসারণ ভূমি, পুঁজি ও শ্রমের নতুন সম্পর্ক তৈরি করে।

চা-বাগান দ্রুত গড়ে উঠলেও খুব শিগগিরই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় শ্রম। চা-শিল্পের প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি ছিল শ্রম। জমি দখল, বন পরিষ্কার, বাগান নির্মাণ এবং উৎপাদনের পরিকাঠামো তৈরি করলেই শিল্প গড়ে ওঠে না, তাকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন বিপুল, নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত এবং তুলনামূলকভাবে সস্তা শ্রমশক্তি। আসামের ক্ষেত্রে এই শ্রমশক্তি সংগ্রহ ও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াই ঔপনিবেশিক শ্রম-রাজনীতির কেন্দ্রীয় প্রশ্নে পরিণত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহ, আড়কাঠিদের ভূমিকা, চুক্তিবদ্ধ শ্রম এবং শ্রমিকদের বাগানের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আবদ্ধ রাখার আইনি ব্যবস্থা মিলিয়ে যে শ্রমব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যেই ‘চা-কুলি’ পরিচয়ের জন্ম হয়।

স্থানীয় জনসংখ্যার বৃহৎ অংশকে নিয়মিতভাবে চা-বাগানের শ্রমে যুক্ত করা সহজ ছিল না। স্থানীয় যারা বাগানে কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। রামকুমার বিদ্যারত্ন তাঁর উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ গ্রন্থে লিখেছেন, -

> “আমি আসামের অনেকগুলি চা বাগান পরিদর্শন করিয়াছি। সেই সকল চা বাগানে আসামী কুলি এত অল্প যে গণনার প্রয়োজন হয় না।”[৩]

ফলে বাগান প্রশাসন ও চা-বাণিজ্যের অগ্রগতির স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিশেষ করে খরা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলি শ্রমিক সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, উড়িষ্যা, বৃহত্তর ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন জেলা, মধ্যভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক আসামে নিয়ে আসা হয়। এই শ্রমিকদের অনেকেই স্বেচ্ছায়, আবার অনেকেই প্রতারণা, প্রলোভন, অসম্পূর্ণ তথ্য কিংবা বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের মধ্য দিয়ে নিয়োগপ্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেন।

রামকুমার উল্লেখ করেছেন, -

> “বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, সাঁওতালী, উড়িয়া ও মাদ্রাজী কুলিরাই এই সকল বাগিচায় কুলির কার্যে নিযুক্ত আছে। এমনকি বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় এমন সকল পল্লী দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথাকার লোকেরা আসাম প্রদেশে আগমন করাতে পল্লী শূন্য অরণ্য প্রায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলে ইচ্ছা পূর্বক আসামে আগমন করে নাই; কিংবা গবর্ণমেন্ট যে বাধ্য করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাও নহে। কলিকাতায় কুলি ডিপো আছে। সেই সকল ডিপোর মহাজনেরা পল্লীগ্রাম হইতে কুলি সংগ্রহ করিয়া আনে। যাহারা পল্লীগ্রামে যাইয়া কুলি সংগ্রহ করে, তাহাদের নাম আড়কাড়ি। আড়কাড়িরা অর্থলোভ ও নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া কুলের কুলবধূদিগকে পর্যন্ত ঘরের বাহির করে, এবং অবশেষে এই সামান্য কার্যে প্রেরণ করে।”[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে শ্রমিক নিয়োগ কেবল একটি কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া ছিল না, এটি ছিল শ্রমিকের সামাজিক ও ভৌগোলিক স্থানান্তরের একটি সংগঠিত ব্যবস্থা। শ্রমিককে তার পূর্ববর্তী গ্রাম, জমি, পরিবার ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি নতুন শ্রম-পরিবেশে নিয়ে আসা হত। এই প্রক্রিয়ায় আড়কাঠি বা শ্রমিক-সংগ্রাহকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শ্রমিকের দারিদ্র্য ও অনিশ্চয়তাকে ব্যবহার করে তাঁকে নতুন কর্মস্থলের দিকে নিয়ে যাওয়া হত।

এই শ্রমব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল চুক্তি। শ্রমিক নিয়োগের সময় তাঁদের অজান্তে বা অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে চুক্তিতে আবদ্ধ করার অভিযোগ ছিল। পরবর্তীকালে আইনি বাধ্যবাধকতা তাঁদের কর্মস্থল ত্যাগের স্বাধীনতাকে সীমিত করত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনের বিভিন্ন বিধান চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মস্থলে আবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা তৈরি করে। ফলে 'চুক্তি' একটি নিছক শ্রম-চুক্তি না থেকে শ্রমিকের চলাচল ও কর্ম-স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

রমেশচন্দ্র দত্ত পরবর্তী সময়ে আসামের চা-শ্রমব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে 'দাসত্ব আইন'-এর ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর সমালোচনার কেন্দ্রে ছিল এমন একটি আইনি কাঠামো, যার মাধ্যমে চা-বাগানের শ্রমিকদের চুক্তির দ্বারা দীর্ঘ সময়ের জন্য আবদ্ধ রাখা হত। এই সমালোচনা থেকে বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক চা-পুঁজির কাছে শ্রমিক কেবল বাজারে কেনাবেচা হওয়া শ্রমশক্তি ছিল না, রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত একটি আবদ্ধ শ্রমসম্পদেও পরিণত হয়েছিল।

'কুলি' শব্দটিও এই শ্রমব্যবস্থার রাজনৈতিক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যে মানুষটি নিজ অঞ্চলে কৃষক, আদিবাসী, দরিদ্র গ্রামবাসী বা অন্যকোনো সামাজিক পরিচয়ের অধিকারী ছিলেন, চা-বাগানে এসে তাঁর বহুমাত্রিক পরিচয় সংকুচিত হয়ে 'কুলি' পরিচয়ে পরিণত হতেন। ঔপনিবেশিক বাগান-প্রশাসনের কাছে 'কুলি' ছিল একটি কার্যকর প্রশাসনিক ও শ্রমিক শ্রেণি– যার সঙ্গে নির্দিষ্ট কাজ, নির্দিষ্ট বাসস্থান, নির্দিষ্ট মজুরি এবং নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ যুক্ত ছিল। এই পরিচয়-নির্মাণের ফলে শ্রমিককে ব্যক্তি হিসেবে নয়, শ্রমশক্তি হিসেবে দেখা সহজ হয়ে ওঠে। তাঁর সামাজিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও মানবিক মর্যাদা গৌণ হয়ে পড়ে।

এই কারণেই চা-কুলি আন্দোলনের ইতিহাসে 'কুলি' শব্দটির রাজনৈতিক অর্থ গুরুত্বপূর্ণ। এটি একই সঙ্গে একটি আরোপিত পরিচয় এবং পরবর্তীকালে প্রতিবাদী পরিচয়ের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। রামকুমার বিদ্যারত্নের গুরুত্ব এখানেই যে তিনি 'কুলি'কে কেবল একটি পরিসংখ্যান বা শ্রম-একক হিসেবে দেখেননি। তাঁর লেখায় কুলি মানুষ, পরিবার, নারী, শিশু এবং যন্ত্রণার অধিকারী ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়। তাঁর বর্ণনার কেন্দ্রে ছিল শ্রমিকের জীবনযাত্রা এবং সেই জীবনের উপর ক্ষমতার হস্তক্ষেপ।

রামকুমার বিদ্যারত্নের আসাম-অভিজ্ঞতার সূচনা শ্রমিক-আন্দোলনের কর্মী হিসেবে হয়নি। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হিসেবে আসামে যান। কিন্তু ধর্মপ্রচারের এই যাত্রাই তাঁকে ঔপনিবেশিক চা-বাগানের সামাজিক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। দূর্গানাথ ঘোষ রচিত পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামনন্দ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত কুলি কাহিনী-র একটি অংশে সেই বাস্তবতার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ –

> "সময় প্রাতঃকাল, সূর্যরশ্মি এখনও শোণিতপুরের অরণ্য ভেদ করিয়া চা-বাগানের কুলিদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। শোণিতপুর একটি জঙ্গলময় রাজ্য। ইহার চতুর্দিকেই পর্বতরাজী মাথা উচ্চ করিয়া যেন কুলিদিগের দুর্দশা দেখিতেছে, শোক দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রস্রবণরূপ অশ্রুজলে ধরণীকে সিক্ত করিতেছে। এই অশ্রুজল শোণিতপুরের চা-বাগান পর্যন্ত আসিয়া নদী ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পর্বতমালার নিম্ন প্রদেশে সুবৃহৎ অরণ্য। এই অরণ্যটি সর্বদাই শাদুল, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তু দ্বারা সচেতন। আমরা শুনিয়াছি কখনও কখনও কুলিদিগের ভীষণ অত্যাচার দর্শন করিয়া এই সব নরশোণিত পিপাসু হিংস্র জন্তুগণও শোকে আকুল হইয়া চীৎকার করিত, সহানুভূতি প্রকাশ করিত। সূর্যোদয় হইলে জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়, তাহার সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারও কথঞ্চিৎ পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে সকলই বিপরীত। সূর্যো-দয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাগানবাসী কুলিদিগের হৃদয়ে ভয়ানক ত্রাস আসিয়া উপস্থিত হয়, বিষাদের ছায়াতে মুখ মলিন হয়, প্রাণনাশ বা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> প্রহারের আশঙ্কায় জীবন নিরাশাময় হইয়া উঠে। এককথায় বলিতে গেলে, কুলিজীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যেন দাসত্বের গভীর তিমিরে ডুবিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহাদের নিকট প্রাতঃকালও যা আর গভীর অমা-রজনীও তা। এ দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন তিনি কখনও অনুভব করিতে পারেন না।”[৫]

এই বর্ণনা শুধু শ্রমিকের দুর্দশার একটি আবেগঘন ছবি নয়; এটি রামকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃতিও প্রকাশ করে। উনিশ শতকের বাংলায় ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশ ধর্মীয় সংস্কারের প্রশ্নকে সামাজিক ন্যায়, নারী-অধিকার, শিক্ষা এবং মানবিক মর্যাদার বৃহত্তর প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করছিল। ফলে রামকুমারের চোখে চা-শ্রমিকের দুর্দশা কেবল অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল না; তা ছিল মানবিক ও নৈতিক সংকট।

রামকুমারের লেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর প্রত্যক্ষতার দাবি। তিনি দূর থেকে চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্পর্কে মতামত দেননি; আসামে গিয়ে বাগান পরিদর্শন করেন এবং নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখেন। তাঁর কুলি কাহিনী, উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ এবং সঞ্জীবনী-তে প্রকাশিত লেখাগুলি এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রকাশ। এই লেখাগুলির মধ্য দিয়ে চা-বাগানের আবদ্ধ জগত কলকাতার শিক্ষিত পাঠকের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা-র রবিবাসরীয়তে রূপম দেব লিখেছেন, -

> “এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ। পাশাপাশি সঞ্জীবনী পত্রিকায় তাঁর লেখা চা-বাগানের শোষণ ও মামলার বিবরণ জনসমক্ষে আসে। চা-শ্রমিকদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের কথা দ্বারকানাথ প্রথম জানতে পারেন রামকুমার বিদ্যারত্নের কাছ থেকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য রামকুমার বিদ্যারত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং গণেশচন্দ্র ঘোষ অসমের প্রচারক হিসেবে মনোনীত হন। এই প্রচারের ফলেই রামকুমার বিদ্যারত্ন ‘উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ’ নামে একটি বই লেখেন। যাতে অসমের চা-শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের কাহিনি লেখা আছে। ১৮৮৩ সালে বাংলা ভাষায় ‘সঞ্জীবনী’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র। সেখানে চা-করদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মামলা চলছিল এবং তাতে ইংরেজ বিচারকরা কী রকম একতরফা রায় দিচ্ছিলেন তার কাহিনি লিখতে শুরু করলেন রামকুমার বিদ্যারত্ন। এর মধ্যে উমেশের মামলা খুব চর্চিত। মিস্টার গর্ডন ছিলেন কালাজোলা নামে সিলেটের এক চা-বাগানের সর্বময় কর্তা। তিনি রাগের চোটে উমেশ নামে এক ১৪ বছরের বালকের সারা শরীর জুতো-সহ পা দিয়ে মাড়িয়ে দেন। যন্ত্রণায় বালকটির মৃত্যু হয়। গর্ডনকে বন্দি করে জেলা আদালতে আনার পর জেলা বিচারক মিস্টার পোপ, গর্ডনকে মুক্ত করে দেন। এই বিষয়টি ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকাতে প্রকাশ পেলে শিক্ষিত মহলে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে।”[৬]

উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর মামলা এবং চা-করদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিচারিক ঘটনার বিবরণ রামকুমারের লেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে চা-বাগানের শ্রমব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশ করে। এখানে প্রশ্নটি শুধু কোনো একজন ম্যানেজার বা মালিকের ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতার নয়; বরং শ্রমিকের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থা কীভাবে কাজ করত, সেই বৃহত্তর প্রশ্নেরও। মামলা হওয়া এবং ন্যায়বিচার পাওয়া যে একই বিষয় নয়, রামকুমারের লেখায় সেই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রামকুমারের লেখা পড়ে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসামের চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেন। তিনি ছদ্মবেশে আসামের চা-বাগানে যান এবং সে সময়কার সীমিত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেই বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগ্রহ করা তথ্য ও পর্যবেক্ষণ বাংলা ভাষায় সঞ্জীবনী পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি ‘দি ব্যঙ্গলী’ পত্রিকায় ‘স্লেভারি ইন ব্রিটিশ ডমিনিয়ন’ নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যা ১৮৮৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পরবর্তীকালে সংকলিত হয়।

দ্বারকানাথের লেখায় নারী শ্রমিকদের অবস্থারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। নারী শ্রমিকদের প্রসবের পর পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ না থাকা এবং সন্তান প্রসবের অল্পদিনের মধ্যেই কাজে ফিরে যেতে বাধ্য হওয়ার মতো বিষয় তাঁর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আলোচনায় উঠে আসে। একইভাবে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের প্রকোপ, শিশু মৃত্যু এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বিষয়ও তাঁর অনুসন্ধানে গুরুত্ব পায়।

দ্বারকানাথের লেখায় শ্রমিকদের উপর শারীরিক শাস্তির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার একটি অংশ হল—

> "স্ত্রী-পুরুষ, বয়স্ক-অল্পবয়স্ক, বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলের জন্য চাবুকের পীড়ন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অসম সরকারের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক আত্মপরিচয় গোপন করে বাগান পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, এক জন চা-শ্রমিককে গাছের সঙ্গে হাত বাঁধা অবস্থায় ম্যানেজার নির্মম ভাবে চাবুক মেরে চলেছে। ১৮৮৪ সালে দুধপাতিলের খড়িল চা বাগানের ম্যানেজার ফ্রান্সিসের বিচার হয় আদালতে। অপরাধ, এক কুলি রমণীকে চাবুক মারতে মারতে মেরে ফেলা। ১৮৮১ সালের রিপোর্টে আমরা পাই, কাছাড় জেলার সাদার্ন সাবডিভিশনের বোয়ালিয়া চা বাগানের ম্যানেজারকে শ্রমিকরা কয়েক ঘণ্টা ঘরে বন্দি করে রাখে। কারণ ম্যানেজার শ্রমিকদের সামনে এক বালককে বেত্রাঘাত করছিল। এই ঘটনার ফলে প্রায় ১২ জন শ্রমিককে তিনদিন থেকে এক মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ম্যানেজারের জন্য ২০০ টাকার জরিমানা ধার্য হয়। পরবর্তী বিচারপতি শ্রমিকদের প্রাপ্য শাস্তি বহাল রাখলেও ম্যানেজারের জরিমানা ২০০ থেকে কমিয়ে ৫০ টাকা করে।"[৭]

এই ধরনের ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে বাগান-শ্রমব্যবস্থায় শাস্তি কেবল কাজের নিয়ম ভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ছিল না; তা শ্রমিকের শরীরের ওপরও সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের জব্দ করার আরেকটি পদ্ধতি ছিল তাঁদের তালাবদ্ধ অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় জানা যায়, বাগানে শ্রমিকদের সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার স্থানে বন্দি করা হত এবং অনেকক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জলও দেওয়া হত না। ১৮৮৪ সালে ডিব্রুগড়ের দমদম চা-তালুকে কেদারনাথ ঘোষ ও শশধর বর্মা এক শ্রমিককে বেআইনি আটকের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। সাক্ষ্যে প্রকাশ পায় যে বহু চা-বাগানে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষের মতো স্থান ছিল।

১৮৮৬ সালের ২৩ অক্টোবর 'দি ব্যঙ্গলী' পত্রিকায় প্রকাশিত লখি বাগদির ঘটনাটিও এই শ্রমব্যবস্থার মানবিক সংকটের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচিত হয়। স্ত্রী-হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েও তিনি অনাহারের কষ্ট এবং স্ত্রীর সম্মতির কথা উল্লেখ করেন। দুজনেই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং স্ত্রী প্রথমে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন বলে বিবরণে আসে। স্বামী আদালতে কারখানার হিসাব খাতা দেখানোর অনুরোধ করলেও বিচারক তাতে সম্মত হননি। এই ধরনের ঘটনাকে কেবল বিচ্ছিন্ন অপরাধ হিসেবে দেখলে চা-বাগানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর গভীরতা অনুধাবন করা কঠিন হয়।

দ্বারকানাথ শুধু সংবাদপত্রে লেখালেখি করেননি; তিনি প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের সাহায্য করারও চেষ্টা করেন। ১৮৮৯ সালের ১২ এপ্রিল গঞ্জামের একদল কুলিকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসামে পাঠানোর খবর পেয়ে তিনি তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন। পুলিশ কমিশনার সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও পরদিন আড়কাঠিরা পুলিশের সাহায্যে তাঁদের চালান করে দেয়। সাঁওতাল পরগনা শ্রমিক সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। দ্বারকানাথের অনুরোধে হাজারিবাগের হরিচাঁদ মৈত্র ও গিরিডির কালীকৃষ্ণ চন্দ্র কুলি-সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করেন। এই ঘটনাগুলি দেখায় যে চা-শ্রমিক প্রশ্নটি ধীরে ধীরে সংবাদপত্রের আলোচনার বাইরে প্রত্যক্ষ সামাজিক ও আইনি হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করছিল।

১৮৮৮ সালে রামকুমার বিদ্যারত্নের কুলি কাহিনী প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রথমে লেখকের নাম ছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল বলে পুনর্মুদ্রণ-সংক্রান্ত সূত্রে উল্লেখ রয়েছে; পরবর্তীকালে এটি রামকুমারের রচনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থটি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছিল। কুলি কাহিনীকে শুধুমাত্র সাহিত্যিক রচনা হিসেবে পড়লে এর রাজনৈতিক তাৎপর্য আংশিক থেকে যায়; আবার একে সরাসরি সরকারি প্রতিবেদন হিসেবেও পড়া যায় না। বরং এটি এমন একটি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যধর্মী রচনা, যেখানে অভিজ্ঞতা, নৈতিক প্রতিবাদ এবং সামাজিক বর্ণনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রামকুমারের লেখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তিনি চা-বাগানের ভিতরের জগতকে কলকাতার পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন। ঔপনিবেশিক বাগান ছিল এক অর্থে একটি আবদ্ধ স্থান। সেখানে মালিক, ম্যানেজার এবং প্রশাসনিক কাঠামো শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। বাইরের সমাজ সেই ক্ষমতার প্রকৃত মাত্রা সহজে দেখতে পেত না। কুলি কাহিনী সেই আবদ্ধ জগতের ভিতরে একটি নৈতিক জানালা খুলে দেয়। এই কারণেই পরবর্তী স্মৃতিচর্চায় কুলি কাহিনীকে চা-শ্রমিকদের জীবন ও শোষণ বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

রামকুমারের লেখার রাজনৈতিক তাৎপর্য এখানেই যে তিনি কেবল অত্যাচারের ঘটনা বলেননি; তিনি পাঠককে প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছিলেন– কেন এমন অত্যাচার সম্ভব? এই প্রশ্নই ব্যক্তিগত অত্যাচারের বিবরণকে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বৃহত্তর পর্যালোচনায় রূপান্তরিত করে। তাঁর লেখায় বিচারব্যবস্থার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চা-বাগানে শ্রমিকের বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটলে মামলা হয়েছে, কিন্তু মামলা হওয়া এবং ন্যায়বিচার পাওয়া এক বিষয় নয়। ক্ষমতাশালী ইউরোপীয় মালিক ও ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষমতার ভারসাম্য সবসময় শ্রমিকের পক্ষে ছিল না।

চা-কুলি আন্দোলনের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। ব্রাহ্মসমাজকে যদি শুধু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবে দেখা হয়, তাহলে রামকুমার ও দ্বারকানাথের ভূমিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অদৃশ্য থেকে যাবে। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রাহ্মসমাজের কিছু সদস্য ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে সামাজিক ন্যায় ও মানবিকতার প্রশ্নকে যুক্ত করেছিলেন। চা-শ্রমিকের প্রশ্ন এই বৃহত্তর সামাজিক নৈতিকতার একটি ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

এখানে ‘জনমত’ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করে। শ্রমিকেরা তখনও আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নের কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত হননি। কিন্তু তাঁদের হয়ে কথা বলার জন্য সংবাদপত্র, সভা, সামাজিক সংগঠন এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ এগিয়ে আসে। সঞ্জীবনী এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রামকুমারের প্রতিবেদন এবং চা-বাগান সম্পর্কিত বিচারিক ঘটনাগুলির প্রকাশনা কলকাতার পাঠক সমাজের সামনে একটি নতুন প্রশ্ন হাজির করে। এইভাবে সংবাদপত্র শ্রমিকের অভিজ্ঞতাকে বৃহত্তর নাগরিক জনপরিসরে পৌঁছে দেওয়ার একটি মধ্যস্থতাকারী ক্ষেত্র তৈরি করে।

তাঁর লেখার বড় শক্তি ছিল প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ। তিনি শ্রমিকদের প্রতিনিধি ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত ব্রাহ্ম প্রচারক ও লেখক। তাঁর লেখায় শ্রমিকের দুঃখ, ক্ষুধা, নিপীড়ন ও অসহায়তা স্পষ্ট হয়ে উঠলেও শ্রমিকেরা নিজেদের রাজনৈতিক ভাষায় কতটা কথা বলেছিলেন, সেটি আলাদা করে অনুসন্ধান করা দরকার। এই কারণে তাঁকে সরাসরি ‘শ্রমিকদের কণ্ঠ’ বলা অপেক্ষা ‘শ্রমিকদের কণ্ঠকে জনপরিসরে অনুবাদকারী’ বলা অধিক যুক্তিযুক্ত। এতে তাঁর ভূমিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কমে না; বরং আরও স্পষ্ট হয়। তিনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের কাজ করেছিলেন, যেখানে বাগানের ভেতরের অভিজ্ঞতা কলকাতার নাগরিক জনপরিসরে প্রবেশ করে।

রামকুমারের লেখায় ব্রাহ্মনৈতিক মানবতাবাদ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা একই সঙ্গে কার্যকর হয়েছে। এর ফলে তাঁর রচনায় শ্রমিকের উপস্থিতি সবসময় একরকম নয়। কখনও শ্রমিককে নিজস্ব অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন, সক্রিয় এবং রাজনৈতিক ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে; আবার কখনও তাঁকে নিপীড়িত ও অসহায় মানুষ হিসেবে, অর্থাৎ সহানুভূতি ও করুণার পাত্র হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দ্বৈততা তাঁর লেখাকে ইতিহাসচর্চার জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

তাই রামকুমারের রচনাকে ইতিহাসচর্চায় ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা জরুরি। প্রথমত, তিনি কী দেখেছেন এবং কোন ঘটনাগুলি তাঁর নজরে এসেছে; দ্বিতীয়ত, তিনি সেই ঘটনাগুলিকে কীভাবে দেখেছেন এবং তাঁর নিজস্ব সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে সেই বর্ণনাকে প্রভাবিত করেছে; এবং তৃতীয়ত, তিনি তাঁর দেখা ও উপলব্ধ ঘটনাগুলিকে কীভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে তৃতীয় প্রশ্নটি ইতিহাসবিদকে সাহিত্য, সংবাদপত্র এবং সামাজিক ইতিহাসের সংযোগস্থলে নিয়ে যায়। ফলে রামকুমারের রচনা শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শ্রমিকজীবনের তথ্য প্রদান করে না; একই সঙ্গে শ্রমিক-প্রশ্ন কীভাবে শিক্ষিত সমাজের কাছে উপস্থাপিত ও ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, তারও গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তীকালে চা-শ্রমিক সমস্যাকে কেবল একটি প্রাদেশিক সমস্যা হিসেবে নয়, বরং বৃহত্তর ভারতীয় সমস্যা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। "১৮৮৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে চা-বাগান শ্রমিক সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব এলে সেটিকে প্রাদেশিক সমস্যা বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে পরবর্তী বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বারকানাথ যুক্তি দেন যে বিষয়টি মোটেই প্রাদেশিক নয়, বরং সর্বভারতীয়; কারণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অন্যায়ভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করে আসামে পাঠানো হচ্ছিল।

দ্বারকানাথের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে তৈরি হওয়া বিক্ষোভ এবং সংবাদপত্রে বিষয়টির আলোচনার ফলে ১৮৯০ সালে চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করে বলে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। এই সময়ে আসামের চা বাগান শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও আলোচনা হয়েছিল। এর ফলে চা-শ্রমিক প্রশ্নটি ক্রমশ বৃহত্তর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক আলোচনার অংশ হয়ে ওঠে।

১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনেও অসমের চা-শ্রমিক বিষয়ক প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত হয় বলে পরবর্তী বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, যিনি 'থিইস্টিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' নামক একেশ্বরবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অসমের চা-শ্রমিকদের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দাসত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য জনৈকা নারীকে ব্রহ্মপুত্র নদে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে দেখেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাবটি সমর্থন করেন এবং বলেন যে ক্রমবর্ধমান চা-শিল্পের বিকাশকে ব্যাহত না করেই 'Slave Act' বা 'Inland Emigration Act' বাতিল করা সম্ভব। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আলোচ্য সূচির অন্তর্গত হয়।

এই ঘটনাগুলিকে চা-শ্রমিক প্রশ্নের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচক হিসেবে দেখা যায়। এর ফলে চা-বাগানের শ্রমিক আর কেবল 'আসামের সমস্যা' হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেন না; বৃহত্তর পরিসরে তিনি 'ভারতীয় শ্রমিক'-এর প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠেন। এই ধারণাগত পরিবর্তন পরবর্তী ভারতীয় শ্রম-রাজনীতির বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত।'[৮]

অসমের চা-শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক সমালোচনা এবং জনমতের চাপের ফলে অসম সরকারের উপরও সংস্কারের চাপ তৈরি হয়। চিফ কমিশনার হেনরি কটনের আমলে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং শ্রমিক নিয়োগে আড়কাঠিদের ভূমিকা ও শোষণ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন সামনে আসে। ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের এই উদ্যোগের একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল– ভারতের জাতীয়তাবাদী জনপরিসরে শ্রমজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রশ্নকে আরও স্পষ্টভাবে যুক্ত করা। তবে এই পরিবর্তনের ফলাফল কতটা কার্যকর হয়েছিল এবং শ্রমিকজীবনে তার বাস্তব প্রভাব কতটা পড়েছিল, তা আলাদা প্রশাসনিক ও শ্রম-ইতিহাসের সূত্র দিয়ে যাচাই করা প্রয়োজন।

আসামের চা-কুলি আন্দোলনের ইতিহাস ঔপনিবেশিক আধুনিকতার এক গভীর বৈপরীত্যকে উন্মোচন করে। ব্রিটিশ শাসন একদিকে শিল্প, বাজার, রেলপথ, সংবাদপত্র ও আইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল; অন্যদিকে একই শাসনব্যবস্থা এমন এক শ্রমনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা শ্রমিকের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও চলাচলের অধিকার সংকুচিত করেছিল। চা-বাগান ছিল এই বৈপরীত্যের অন্যতম স্পষ্ট ক্ষেত্র।

এই প্রেক্ষাপটে রামকুমার বিদ্যারত্নের ভূমিকা নতুন করে মূল্যায়ন করা জরুরি। তিনি শ্রমিক সংগঠনের নেতা ছিলেন না, কোনো বৃহৎ আন্দোলনও পরিচালনা করেননি। তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল দেখা, লেখা এবং জনসমক্ষে প্রশ্ন তোলা। কুলি কাহিনী, উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ এবং অন্যান্য লেখায় চা-শ্রমিক বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের কাছে কেবল উৎপাদনের উপাদান হিসেবে নয়, বরং নির্যাতিত মানুষ, পরিবার-পরিজন সম্পন্ন ব্যক্তি এবং অধিকারসম্পন্ন শ্রমিক হিসেবে উপস্থিত হয়।

রামকুমারের এই লেখালেখি চা-শ্রমিক প্রশ্নকে ব্যক্তিগত দুর্দশার বিবরণ থেকে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় করে তুলতে সাহায্য করে। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সরেজমিন অনুসন্ধান, সংবাদপত্রে ধারাবাহিক

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আলোচনা এবং ব্রাহ্মসমাজ, ভারত সভা ও জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্তের একাংশের সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে প্রশ্নটি আরও বিস্তৃত জনপরিসরে প্রবেশ করে। এই কারণে রামকুমারের রচনাকে আন্দোলনের কেবল পূর্বপর্ব হিসেবে নয়, বরং আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠা জনমত ও নৈতিক ভাষার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে দেখা অধিক যুক্তিযুক্ত।

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও রামকুমার বিদ্যারত্ন গ্রন্থের আলোকে তাঁর ভূমিকা কেবল সমাজসেবা বা মানবিক সহানুভূতির ইতিহাসে সীমাবদ্ধ রাখলে বিষয়টির রাজনৈতিক তাৎপর্য আড়াল হয়ে যায়। তাঁর লেখায় ঔপনিবেশিক শ্রমব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে অনুসন্ধান, সংবাদপত্র, জনমত ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করে।

অতএব, রামকুমার বিদ্যারত্নের ঐতিহাসিক গুরুত্ব শুধু এই কারণে নয় যে তিনি চা-কুলিদের দুর্দশা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বড় অবদান ছিল সেই দুর্দশাকে জনসমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নে পরিণত করা। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে চা-শ্রমিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অদৃশ্য শ্রমশক্তি থেকে দৃশ্যমান মানবিক ও রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত হয়। তিনি শ্রমিকের নিজস্ব কণ্ঠের সরাসরি প্রতিনিধি ছিলেন না; বরং শ্রমিকের অভিজ্ঞতাকে একটি বৃহত্তর শিক্ষিত জনপরিসরে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদই তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কেন্দ্রে অবস্থান করে।

এই কারণেই রামকুমারকে পুনরায় পাঠ করা মানে শুধু একজন সমাজ সংস্কারককে স্মরণ করা নয়; বরং ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রম, ক্ষমতা, জনমত ও প্রতিরোধের পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুনভাবে বোঝা। তাঁর লেখার সঙ্গে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসন্ধান, সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সরকারি নথি এবং চা-শ্রমিকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সূত্রগুলি একত্রে পাঠ করলে আসামের চা-কুলি আন্দোলনকে কেবল একটি আঞ্চলিক শ্রম-সংগ্রাম হিসেবে নয়, বরং ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে শ্রম-নিয়ন্ত্রণ, মানবিক মর্যাদা এবং জনমত নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বোঝা সম্ভব।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল, আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও রামকুমার বিদ্যারত্ন, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১০০
২. তদেব, পৃ. ১০০
৩. তদেব, পৃ. ১০৩
৪. তদেব, পৃ. ১০৩
৫. তদেব, পৃ. ১৪১
৬. দেব, রূপম, "চা-শ্রমিকদের আন্দোলন ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়", আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ৩০ জানুয়ারি ২০২২
৭. তদেব
৮. তদেব

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল, আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও রামকুমার বিদ্যারত্ন, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৮৯
বিদ্যারত্ন, রামকুমার, কুলি কাহিনী, কলকাতা : দে বুক স্টোর-এর পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, মূল প্রকাশ : ১৮৮৮
বিদ্যারত্ন, রামকুমার, উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ।
Dutta, R. C. The Economic History of India under Early British Rule. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1902
Gangopadhyay, Dwarakanath. Slavery in British Dominion. Kolkata: Jijnasa, 1959
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত চন্দ্র, ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কোষা, কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৪২
দত্ত, অমর, আসামে চা কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ, কলকাতা : গ্রন্থমিত্র, ২০০৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 71
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 630 - 639
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Chattopadhyay, Kanailal (ed.). Dwarakanath Ganguly's Slavery in British Dominion. Kolkata: Jijnasa, 1959.

সেন, সুকোমল, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০–২০১০)

দেব, রূপম, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ জানুয়ারি ২০২২